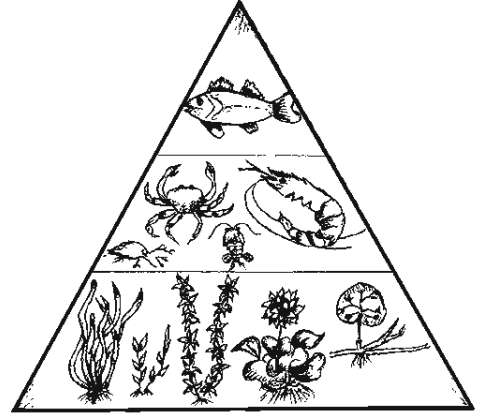


ত্রয়োদশ অধ্যায়

জীবের পরিবেশ

জীবের চারপাশের জড় ও জীবজ সমুদয় বস্তু নিয়েই জীবের পরিবেশ গঠিত হয়। আলো, হাওয়া, ঝড়-বৃষ্টি, মাটি, পানি যেমন একটি জীবের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ তেমনি তাকে ঘিরে যে জীব জগৎ তার প্রভাবও ঐ জীবের জীবনে অবশ্যই থাকে। একটি জীবের জীবন ধারণের বিভিন্ন পর্যায়ে যেসব পদক্ষেপগুলো নিতে হয় তা অবশ্যই একই পরিবেশে বসবাসকারী অন্য জীবের জীবনাচারে প্রভাব ফেলে। জীব জগতে খাদ্য শিকল ও খাদ্য জাল খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যাকে বাদ দিয়ে জীবের অস্তিত্বের কথা কল্পনা করা যায় না।



এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা-

- বাস্তুতন্ত্র ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বাস্তুতন্ত্রের উপাদানসমূহের আন্তঃসম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে পারব।
- খাদ্য শিকল ও খাদ্য জাল ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বাস্তুতন্ত্রে শক্তির প্রবাহ ও পুষ্টি উপাদানের সম্পর্ক তুলনা করতে পারব।
- ট্রফিক লেভেলের মধ্যে শক্তির সম্পর্ক তুলনা করতে পারব।
- শক্তি পিরামিডের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- খাদ্য শিকল সীমিত রাখতে শক্তি পিরামিডের প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- জীব বৈচিত্র্য এবং জীব বৈচিত্র্যের প্রকারভেদ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বাস্তুতন্ত্রের স্থিতিশীলতা রক্ষায় জীববৈচিত্র্যের প্রভাব মূল্যায়ন করতে পারব।
- পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বিভিন্ন জীবের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া ও আন্তঃনির্ভরশীলতা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পরিবেশ সংরক্ষণ পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় পরিবেশ সংরক্ষণের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারব।
- একটি নির্বাচিত এলাকার উৎপাদক, খাদক, বিয়োজক এবং পরিবেশের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় করতে পারব।
- একটি নির্দিষ্ট পরিবেশের উপাদানসমূহ দূষিত হওয়ার কারণ নির্ণয় করতে পারব।
- বাস্তুতন্ত্রে শক্তির প্রবাহ, খাদ্য শিকল, খাদ্য জালের প্রবাহচিত্র অংকন করতে সক্ষম হব।
- পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বাস্তুতন্ত্রের উপাদানের অবদান উপলব্ধি করতে পারব এবং এর সংরক্ষণে সচেতন হব।

বাস্তুতন্ত্র (Ecosystem)

পৃথিবীর সব জীব, জড় এবং ভৌত অবস্থা সব মিলেই আমাদের পরিবেশ। জীব সক্রিয়ভাবে জড়জগৎ থেকে তাদের প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ করে জীবিকা নির্বাহ করে এবং বর্জ্য পদার্থ হিসেবে বা মৃত্যুর পর পরিবেশে মিশে গিয়ে সে সব গৃহীত উপাদান আবার জড় পরিবেশেই ফিরিয়ে দেয়। সবুজ উদ্ভিদ বায়ু থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং মাটি থেকে পানি সংগ্রহ করে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় তাদের প্রধান খাদ্য কার্বোহাইড্রেট (শর্করা) তৈরির সময় অক্সিজেন ত্যাগ করে। পুরো জীবজগৎ (উদ্ভিদ ও প্রাণী)-এর শ্বসনের জন্য যতটুকু অক্সিজেন প্রয়োজন তার একটি বড় অংশ আসে ঐ সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়া থেকে। সবুজ-অসবুজ উভয় প্রকার উদ্ভিদ মাটি বা পানি থেকে কিছু খনিজলবণও খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। তৃণভোজী প্রাণীরা নানাভাবে উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশ খেয়ে বাঁচে। বিভিন্ন স্তরের মাংসাশী প্রাণীরা তৃণভোজী বা অন্যান্য ক্ষুদ্রতর মাংসাশী প্রাণীদের খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। সকল প্রাণীর বর্জ্যপদার্থ পরিবেশেই মিশে যায়। তাছাড়া মৃত্যুর পর উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহ পচনক্রিয়ার মাধ্যমে আবার পরিবেশেই ফিরে যায়। এই পচানোর কাজটি করে ব্যাকটেরিয়াসহ কিছু অণুজীব। এভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য প্রাকৃতিক নিয়মেই বজায় থাকে।

প্রাকৃতিক পরিবেশে উদ্ভিদ ও প্রাণী এবং উভয় প্রকার জীব ও জড় পদার্থের মধ্যে শক্তি ও বস্তু এই আদান প্রদানকে বলা হয় মিথস্ক্রিয়া, আর এরূপ মিথস্ক্রিয়ায় আন্তঃসম্পর্ক ঘটে, পৃথিবীর এমন যেকোনো অঞ্চলই হচ্ছে বাস্তুতন্ত্র (Ecosystem)। সুতরাং বাস্তুতন্ত্র বলতে ভূপৃষ্ঠের এমন কোনো একককে বোঝায় যেখানে জড়, খাদ্য উৎপাদনকারী সবুজ উদ্ভিদ, খাদ্যের জন্য উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল কিছু প্রাণী এবং মৃত জীবদেহ পরিবেশে মিশিয়ে দেওয়ার জন্য অণুজীব আছে এবং এসব উপাদানের মধ্যে যথাযথ আন্তঃসম্পর্ক বর্তমান। জীবজগতের পুষ্টি ও অন্যান্য শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ার বিভিন্ন উপাদানের উৎস হিসেবে মাটি, পানি ও বায়ুর প্রয়োজন হয়।

বাস্তুতন্ত্রের উপাদানসমূহ : জীব সম্প্রদায়, পরিবেশের জড় পদার্থ এবং ভৌত পরিবেশ মিলেই কোনো স্থানের বাস্তুতন্ত্র গড়ে উঠে। এই তিনটি প্রধান উপাদানের প্রত্যেকটিতে রয়েছে আবার অনেক ধরনের ছোট ছোট উপাদান। জীব উপাদানগুলো সবচেয়ে বৈচিত্র্যময়।

(ক) জড় উপাদান (Nonliving matters) : পরিবেশের জড় পদার্থগুলো জীব উপাদানের জন্য বাসস্থান নির্মাণ করে, শ্বসনের জন্য অক্সিজেন যোগায় এবং বেশ কিছু পুষ্টি উপাদানও সরবরাহ করে। বাস্তুতন্ত্রের সকল জড় উপাদানকে আবার অজৈব এবং জৈব দুভাগে ভাগ করা যায়।

(১) অজৈব বস্তু (Inorganic matters) : পানি, বায়ু এবং মাটিতে অবস্থিত খনিজ পদার্থ অর্থাৎ যেসব পদার্থ কোনো জীবদেহ থেকে আসেনি, বরং জীবের উদ্ভবের আগেই পরিবেশে ছিল সেগুলো বাস্তুতন্ত্রের অজৈব উপাদান যেমন- ক্যালসিয়াম, পটাসিয়াম, লৌহ, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড ইত্যাদি।

(২) জৈব বস্তু (Organic matters) : উদ্ভিদ ও প্রাণীর বর্জ্য পদার্থ বা এসব জীবের মৃতদেহ থেকে যেসব জড় বস্তু বাস্তুতন্ত্রে যোগ হয় তাদের বলা হয় জৈব উপাদান। এগুলো সচরাচর হিউমাস নামে পরিচিত। হিউমাসের উপাদানের মধ্যে আছে ইউরিয়া, উদ্ভিদ ও প্রাণীর বিভিন্ন কোষ, টিস্যু, অঙ্গ ইত্যাদি। জৈব বস্তু উদ্ভিদের জন্য বেশি পুষ্টিকর। তাই উদ্ভিদ চাষে বেশি করে জৈব সার দিতে হয়। বহু প্রাণীও হিউমাসসমৃদ্ধ মাটি বেশি পছন্দ করে।

(খ) ভৌত উপাদান (Physical components) : পরিবেশে সূর্যালোকের পরিমাণ, তাপমাত্রা, বায়ুতে জলীয়বাষ্পের পরিমাণ, বায়ুর চাপ ও বায়ুপ্রবাহ, ভূপৃষ্ঠ থেকে গভীরতা (মাটির নিচে বা পানির নিচে) এবং উচ্চতা ইত্যাদি বহু উপাদান বাস্তুতন্ত্রকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। এসব উপাদান মিলে গড়ে ওঠে কোনো অঞ্চলের আবহাওয়া ও জলবায়ু। এসবই কোনো বাস্তুতন্ত্রের ভৌত উপাদান।

(গ) **জীবজ উপাদান (Living components)** : জীবকূল বাস্তুতন্ত্রের সক্রিয় উপাদান। এরাই তাদের কাজের মাধ্যমে পরিবেশে বিভিন্ন পরিবর্তন আনে। পরিবেশের জীব উপাদানগুলো প্রধানত তিন প্রকার। যথা: (১) উৎপাদক, (২) খাদক ও (৩) বিয়োজক।

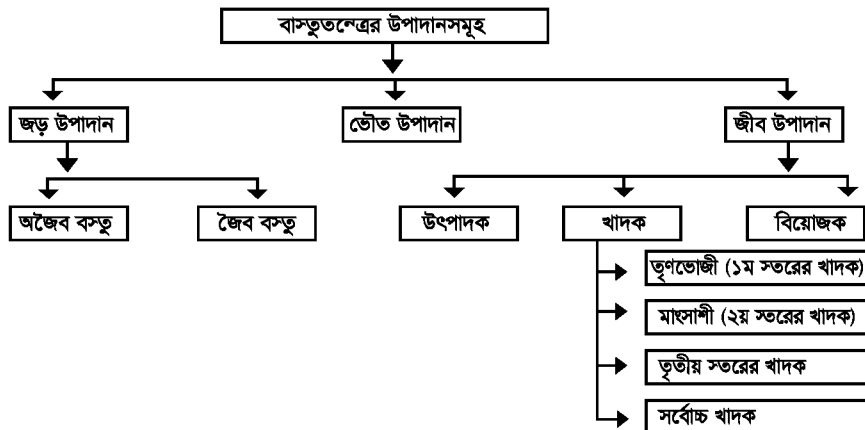
(১) **উৎপাদক (Producer)** : সবুজ উদ্ভিদ সূর্যালোকের উপস্থিতিতে বায়ু থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং মাটি থেকে পানি সংগ্রহ করে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় তাদের প্রধান খাদ্য কার্বোহাইড্রেট (শর্করা) তৈরি করে। এ সময় উপজাত হিসেবে অক্সিজেন ত্যাগ করে। পুরো প্রাণীজগৎ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাদের প্রধান খাদ্য শর্করার জন্য এই সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল। এমনকি অসবুজ উদ্ভিদও কোনো না কোনোভাবে তাদের জীবনধারণের জন্য সবুজ উদ্ভিদের উপরই নির্ভরশীল। তাই সালোকসংশ্লেষণ হচ্ছে বাস্তুতন্ত্রের উৎপাদন প্রক্রিয়া। আর উৎপাদক হলো সবুজ উদ্ভিদকূল। এই উৎপাদক উদ্ভিদগুলোকে অন্য কথায় বলা হয় স্বভোজী (Autotroph)। কারণ তারা নিজের খাবার নিজেই তৈরি করতে পারে, অন্য কোনো জীবের উপর খাদ্যের জন্য নির্ভর করতে হয় না।

(২) **খাদক (Consumer)** : কোনো প্রাণীই পরিবেশের জড় পদার্থ থেকে খাদ্য তৈরি করতে পারে না। তারা খাদ্যের জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সবুজ উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল। তাই এদের বলা হয় পরভোজী জীব। যেসব প্রাণী সরাসরি উদ্ভিদ থেকে খাদ্য গ্রহণ করে তাদেরকে বলা হয় তৃণভোজী প্রাণী। এদের অপর নাম প্রথম শ্রেণির খাদক। ঘাস ফড়িং, মুরগি, গরু, ছাগল, হরিণ ইত্যাদি প্রথম শ্রেণির খাদক।

যেসব প্রাণী তৃণভোজী প্রাণীদের খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে তাদের বলা হয় গৌণ খাদক বা দ্বিতীয় শ্রেণির খাদক। এরা এক ধরনের মাংসাশী প্রাণী। ব্যাঙ, শিয়াল, বাঘ ইত্যাদি দ্বিতীয় শ্রেণির খাদক।

যেসব প্রাণী গৌণ খাদকদের খেয়ে বাঁচে তারাও মাংসাশী প্রাণী। এদের বলা যায় তৃতীয় শ্রেণির বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ খাদক। সাপ, ময়ূর, বাঘ ইত্যাদি এই শ্রেণির খাদক। একটি বিশেষ শ্রেণির খাদক জীবন্ত প্রাণীর চেয়ে মৃত প্রাণীর মাংস বা আবর্জনা খেতে বেশি পছন্দ করে। যেমন- শকুন, শিয়াল, হায়েনা ইত্যাদি। এদের নাম দেওয়া হয়েছে আবর্জনাভুক বা ধাঙর (Scavenger)। কারণ এরা মৃতদেহ বা আবর্জনা খেয়ে পরিবেশ পরিষ্কার রাখে।

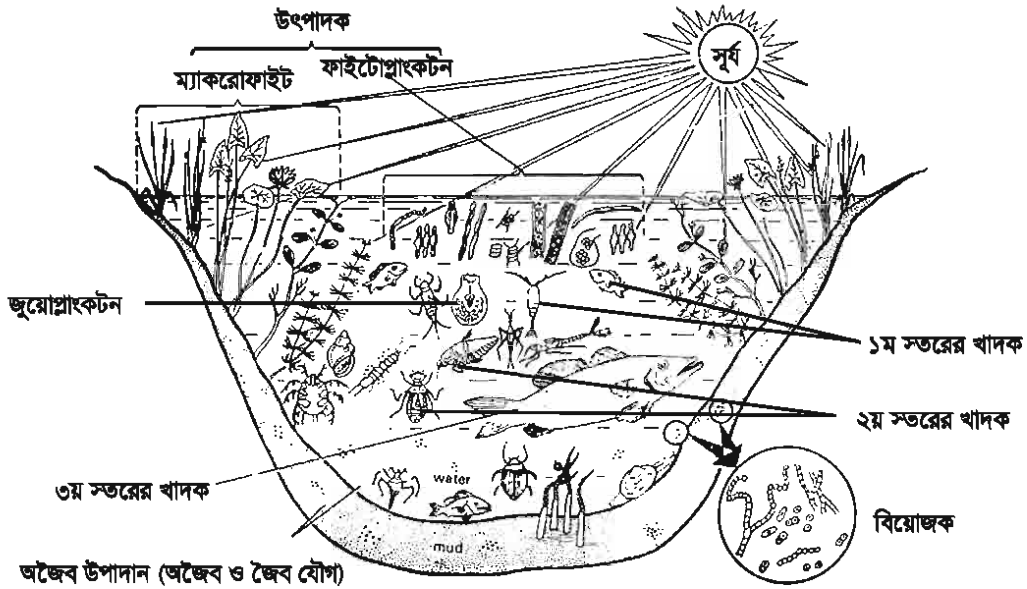
(৩) **বিয়োজক (Decomposer)** : ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক ইত্যাদি অতিক্ষুদ্র জীব বা অণুজীব উদ্ভিদ ও প্রাণীর বর্জ্য পদার্থ এবং মৃতদেহ থেকে তাদের খাদ্য গ্রহণ করে এবং পরিণামে এসব বর্জ্য বিয়োজিত হয়ে মাটি বা পানির সাথে মিশে যায়। এই মিশে যাওয়া উপাদান তখন উদ্ভিদের পক্ষে আবার খাদ্য উপাদান হিসেবে গ্রহণ করা সম্ভব হয়। তাই এই অণুজীবগুলোকে বলা হয় বিয়োজক বা পরিবর্তক।



চিত্র ১৩.১ : বাস্তুতন্ত্রের উপাদানসমূহ (ছক আকারে)

পুকুরের বাস্তুতন্ত্র (Ecosystem of a pond) : জলভাগের বাস্তুতন্ত্র কাছে থেকে ভালো করে দেখার জন্য সবচেয়ে উপযোগী হচ্ছে পুকুর। পুকুরে বসবাসরত জীব ও জড় পদার্থের নিবিড় সম্পর্ক ভালোভাবে বোঝা যায়। জড় উপাদানগুলো হলো বিভিন্ন প্রকার জৈব ও অজৈব পদার্থ, পানি, সূর্যালোক, কার্বন ডাইঅক্সাইড, অক্সিজেন, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, ইত্যাদি। সজীব উপাদানগুলোর মধ্যে আছে উৎপাদক, প্রথম স্তরের খাদক, দ্বিতীয় স্তরের খাদক, তৃতীয় স্তরের খাদক ও বিভিন্ন রকম বিয়োজক।

উৎপাদক : উৎপাদক হচ্ছে সালোকসংশ্লেষণকারী বিভিন্ন প্রকার শৈবাল ও অগভীর পানির উদ্ভিদ। পানিতে ভাসমান ক্ষুদ্র জীবদের প্রাণকটন বলে। ফাইটোপ্লাংকটন বা উদ্ভিদ প্রাণকটন, সবুজ জলজ শৈবাল ও অন্যান্য জলজ উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় খাদ্য তৈরি করে তাই এদের উৎপাদক বলে।



চিত্র ১৩.১ : একটি পুকুরের বাস্তুতন্ত্র

প্রথম স্তরের খাদক : নানা ধরনের ভাসমান ক্ষুদ্র পোকা, মশার শূককীট, অতিক্ষুদ্র প্রাণী, জুয়োগ্রাফকটন প্রভৃতি প্রথম স্তরের খাদক। ভাসমান ক্ষুদ্র প্রাণীদের জুয়োগ্রাফকটন বলে। এ খাদকগুলো নিজেরা খাদ্য প্রস্তুত করতে পারে না তাই সরাসরি উৎপাদককে ভক্ষণ করে বেঁচে থাকে।

দ্বিতীয় স্তরের খাদক : ছোট মাছ, কিছু জলজ পতঙ্গ, ব্যাঙ প্রভৃতি দ্বিতীয় স্তরের খাদক। এরা নিজে খাদ্য প্রস্তুত করতে পারে না এবং উৎপাদককেও খাদ্য হিসেবে সরাসরি গ্রহণ করতে পারে না। এরা প্রথম স্তরের খাদকদের খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে।

তৃতীয় স্তরের খাদক: কোনো কোনো ছোট মাছ, চিথিড়ি ইত্যাদি দ্বিতীয় স্তরের খাদককে ভক্ষণ করে তাদের তৃতীয় স্তরের খাদক বলে। শোল, বোয়াল, ভেটকি প্রভৃতি বড় মাছ, বক ইত্যাদি হচ্ছে তৃতীয় স্তর বা সর্বোচ্চ খাদক।

বিয়োজক: পুকুরের পানিতে বহু ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়া মৃতজীবী হিসেবে বাস করে, এদের বিয়োজক বলে। এরা পানিতে ভাসমান বা পানির তলায় কাদার মধ্যে বাস করে। এরা জীবিত বা মৃত প্রাণীদের আক্রমণ করে ও পচনে সাহায্য করে, ফলে উৎপাদকের ব্যবহার উপযোগী জৈব ও অজৈব রাসায়নিক পদার্থ পুনরায় সৃষ্টি হয়। এসব বিয়োজিত উপাদানগুলো আবার পুকুরের উৎপাদক শ্রেণির জীব ব্যবহার করে।

খাদ্য শিকল (Food chain) : যে কোনো বাস্তুতন্ত্রের জীব উপাদানগুলোর মধ্যে প্রথম কাজে নামে উৎপাদক সবুজ উদ্ভিদ। তারা খাদ্য তৈরি না করলে তৃণভোজী প্রাণী ও মাংসাশী প্রাণীরা খাদ্য সঙ্কটে পড়ে মারা যেতে পারে। যখন খাদ্য শক্তি উৎপাদক থেকে শুরু করে বিভিন্ন স্তরের খাদকদের মধ্যে প্রবাহিত হয়, তখন সেই প্রবাহকে এক সাথে খাদ্য শিকল বলা হয়।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায় মাঠের সবুজ ঘাস উৎপাদক, ঘাস ফড়িং সে ঘাসের অংশবিশেষ খেয়ে বাঁচে। ব্যাঙ ঐ ঘাস ফড়িংকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে, আর সাপ সে ব্যাঙকে আস্ত গিলে খায়। যদি মনে করা হয় সাপটি আকারে ছোট এবং আশেপাশে বেশ বড় একটি গুঁইসাপ আছে। তাহলে সুযোগ পেলে ঐ গুঁইসাপ সাপটিকে আবার গিলে খাবে। সেক্ষেত্রে খাদ্যশৃঙ্খলটিকে নিচের মতো করে লেখা যাবে:

ঘাস	ফড়িং	ব্যাঙ	সাপ	গুঁইসাপ
উৎপাদক	প্রথম স্তরের খাদক	দ্বিতীয় স্তরের খাদক	তৃতীয় স্তরের খাদক	সর্বোচ্চ স্তরের খাদক

বিভিন্ন প্রকার বাস্তুতন্ত্রে খাদ্য শিকল বিভিন্ন প্রকার হতে পারে। যথা: (১) শিকারজীবী খাদ্য শিকল, (২) পরজীবী খাদ্য শিকল, (৩) মৃতজীবী খাদ্য শিকল।

(১) **শিকারজীবী খাদ্য শিকল (Predator food chain) :** যে খাদ্য শিকলে প্রথম স্তরের খাদক আকারে সবচেয়ে ছোট থাকে এবং পর্যায়ক্রমে উপরের খাদকেরা নিচের স্তরের খাদকগুলো শিকার ধরে খেয়ে একেবারে শেষ করে দেয় সেবুপ শিকলকে বলা হয় শিকারজীবী খাদ্য শিকল। উপরে বর্ণিত খাদ্য শিকলটি একটি শিকারজীবী খাদ্য শিকল।

(২) **পরজীবী খাদ্য শিকল (Parasitic food chain) :** পরজীবী উদ্ভিদ ও প্রাণী অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিজেদের চেয়ে বড় আকারের পোষকদেহ থেকে খাদ্য গ্রহণ করে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে একটি পরজীবীর উপর আরেক ধরনের ক্ষুদ্রতর পরজীবী তার খাদ্যের জন্য নির্ভরশীল হয়। এ ক্ষেত্রে খাদ্যশৃঙ্খলের প্রথম ধাপে সবসময় সবুজ উদ্ভিদ নাও থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে শিকলটি থাকে অসম্পূর্ণ, যেমন—

মানুষ —————> মশা —————> ডেঙ্গুভাইরাস।

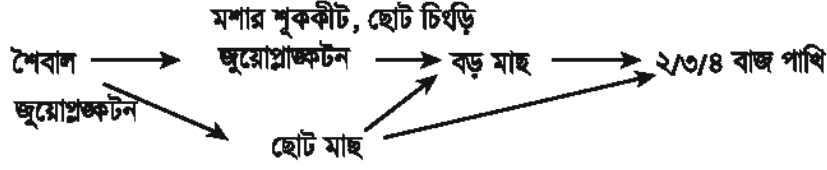
(৩) **মৃতজীবী খাদ্য শিকল (Saprophytic food chain) :** জীবের মৃতদেহ থেকে শুরু হয়ে যদি কোনো খাদ্যশৃঙ্খল একাধিক খাদ্যস্তরে বিন্যস্ত হয় তবে সেবুপ শিকলকে বলা হয় মৃতজীবী খাদ্য শিকল। যেমন—

মৃতদেহ —————> ছত্রাক —————> কেঁচো।

বলাবাহুল্য এই খাদ্য শিকল অবশ্যই অসম্পূর্ণ এবং এরূপ শিকল বাস্তুতন্ত্রের যাবতীয় মিথস্ক্রিয়া বা আন্তঃসম্পর্কের অংশমাত্র তৈরি করে। পরজীবী ও মৃতজীবী খাদ্য শিকল সব সময়ই অসম্পূর্ণ থাকে। কারণ এখানে কোনো উৎপাদক নেই। এই উভয় প্রকার খাদ্য শিকল তাদের কার্যকারিতা বজায় রাখার জন্য শিকারজীবী খাদ্য শিকলের প্রথম এক বা একাধিক স্তরের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং বাস্তুতন্ত্রের খাদ্য শিকল উৎপাদক সবুজ উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার কার্যকারিতার উপর প্রতিষ্ঠিত।

খাদ্য জাল (Food web)

অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় বাস্তুতন্ত্রের খাদ্য শিকলে একই খাদক বিভিন্ন স্তরে স্থান পেতে পারে। এভাবে বেশ কয়েকটি খাদ্য শিকল একত্রিত হয়ে একটি জালের মতো গঠন তৈরি করে। একে খাদ্য জাল বলে। স্থলজ ও জলজ উভয় পরিবেশের জন্য এই ঘটনা সত্য। পুকুরের বাস্তুতন্ত্রের নিচের উদাহরণটি থেকে এ বিষয়টি আরও স্পষ্ট হবে—



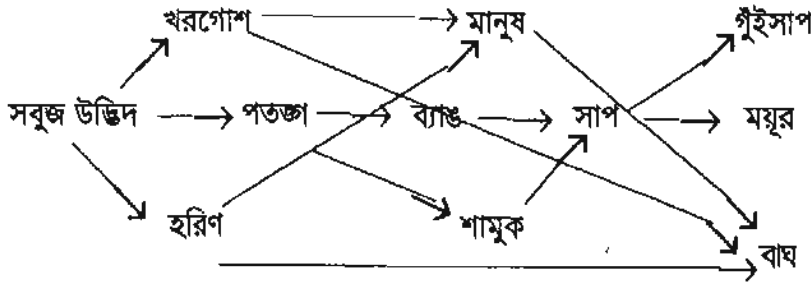
চিত্র : ১৩.৩ খাদ্যজাল

উপরের চিত্রে দেখা যায় উৎপাদক শৈবাল জুরোপ্লাঙ্কটন এবং ছোট মাছকে সরাসরি খাদ্য সরবরাহ করে। জুরোপ্লাঙ্কটকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে ছোট এবং বড়মাছ উভয়ই। বড়মাছ আবার ছোটমাছকে খায়। বাজ পাখি ছোট মাছ এবং বড় মাছের একই প্রজাতির একটু ছোট সদস্যদের সহজেই খেতে পারে। এখানে পাঁচটি জীব বিভিন্নভাবে বেশ কয়েকটি খাদ্য শিকল তৈরি করে। এভাবে যে খাদ্যজাল তৈরি হয়েছে বিভিন্ন বাস্তুতন্ত্র এর চেয়েও জটিল খাদ্যজাল তৈরি হতে পারে।

উপরের খাদ্যজালে মোট চারটি খাদ্য শিকল পাওয়া যায়।

১. শৈবাল → ছোট মাছ → বাজ পাখি।
২. শৈবাল → জুরোপ্লাঙ্কটন → বড় মাছ → বাজ পাখি।
৩. শৈবাল → ছোট মাছ → বড় মাছ → বাজ পাখি।
৪. শৈবাল → জুরোপ্লাঙ্কটন → ছোট মাছ → বড় মাছ → বাজ পাখি।

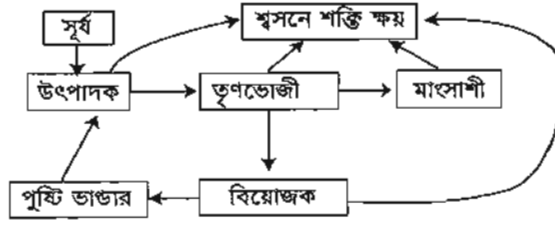
বনভূমির বাস্তুতন্ত্রে খাদ্য জাল হতে পারে নিম্নরূপ:



চিত্র-১৩.৪ : বনভূমির একটি খাদ্যজাল

কাজ: চিত্র ১৩.৩ এ উল্লিখিত খাদ্যজালে যেসব খাদ্য শিকল আছে তা লেখ।

বাস্তুতন্ত্রে পুষ্টি প্রবাহ (Nutrient flow in ecosystem) : উদ্ভিদ অজৈব বস্তু গ্রহণ করে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় খাদ্য প্রস্তুত করে। উদ্ভিদ যে খাদ্য তৈরি করে তার কিছু অংশ নিজ প্রয়োজনে ব্যবহার করে, অবশিষ্টাংশ উদ্ভিদ দেহেই জমা থাকে। তৃণভোজী প্রাণী এসব উদ্ভিদ খায় এবং পরায়ক্রমে মাংসাশী প্রাণীগুলো এসব তৃণভোজীদের খায়। এসব উদ্ভিদ ও প্রাণীদের মৃত্যুর পর বিয়োজকগুলি এদের খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে অজৈব বস্তুতে রূপান্তরিত করে পরিবেশে ফিরিয়ে দেয়। সবুজ উদ্ভিদ এসব অজৈব বস্তু গ্রহণ করে এবং পুনরায় খাদ্য প্রস্তুতে ব্যবহার করে থাকে। পুষ্টিদ্রব্যের এরূপ চক্রাকারে প্রবাহিত হওয়ার প্রক্রিয়াটিকে পুষ্টিপ্রবাহ বলে। খাদ্যশৃঙ্খলের মাধ্যমে এরূপ পুষ্টির প্রবাহ বাস্তুতন্ত্রের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।



চিত্র-১৩.৫ : পুষ্টিদ্রব্য প্রবাহ এবং শক্তি প্রবাহের সংক্ষিপ্ত চিত্র

বাস্তুতন্ত্রে শক্তির প্রবাহ (Energy flow in the ecosystem) : যেকোনো বাস্তুতন্ত্রের শক্তির মূল উৎস সূর্য। সূর্য থেকে যে পরিমাণ আলো ও তাপশক্তি পৃথিবীতে এসে পৌঁছে তার বড়জোড় ২% সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় সবুজ উদ্ভিদ বাস্তুতন্ত্রের পরবর্তী ধাপগুলোর জন্য প্রাথমিকভাবে উৎপন্ন শর্করায় রাসায়নিক শক্তি হিসেবে মজুদ করে। বিভিন্ন প্রকার খাদ্য শিকলের মাধ্যমে উদ্ভিদে জমা হওয়া এই শক্তি বিভিন্ন খাদ্যস্তরে পৌঁছায়। শেষ পর্যন্ত বিয়োজকের কাজের ফলে সকল শক্তি আবার পরিবেশে ফিরে আসে।

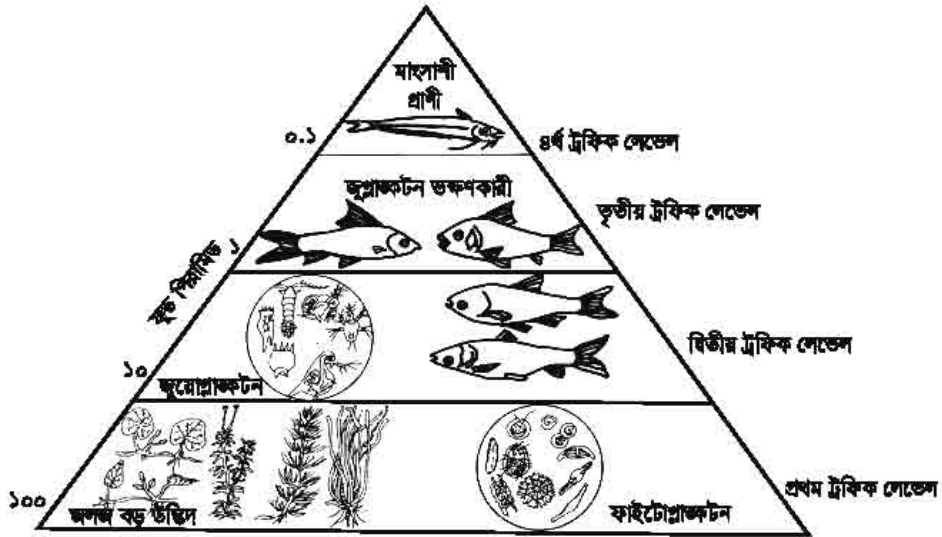
ভূগোষ্ঠী প্রাণীরা অর্থাৎ বাস্তুতন্ত্রের প্রথম স্তরের খাদকেরা সবুজ উদ্ভিদের পাতা, কাণ্ড, ফুল, ফল, বীজ বা মূল থেকে জীবন ধারণ করে। এভাবে সবুজ উদ্ভিদে উৎপাদিত রাসায়নিক শক্তি প্রথমে ভূগোষ্ঠী প্রাণীতে পৌঁছে। মাংসাশী প্রাণী যারা প্রথম স্তরের খাদকদের (ভূগোষ্ঠী প্রাণীদের) খেয়ে বাঁচে তারাই দ্বিতীয় স্তরের খাদক। প্রথম স্তরের খাদক থেকে এভাবে রাসায়নিক শক্তি দ্বিতীয় স্তরের খাদকের দেহে স্থানান্তরিত হয়। অনুরূপভাবে দ্বিতীয় স্তরের খাদক থেকে রাসায়নিক শক্তি খাদ্য আকারে তৃতীয় স্তরের খাদকে পৌঁছে। যদি তৃতীয় স্তরের খাদককে আরও উচ্চতর কোনো খাদক খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে তবে একই প্রক্রিয়ায় শক্তি সর্বোচ্চ স্তরের খাদকে পৌঁছে।

সব জীবে মৃত্যুর পর তার শক্তি গ্রহণ প্রক্রিয়া স্থগিত হয়ে যায়। তখন ঐ মৃতদেহে সঞ্চিত রাসায়নিক শক্তি বিয়োজকের কাজের ফলে ভেঙে জড় পদার্থ বা শক্তি আকারে পরিবেশে ফিরে আসে। পরিবেশের বিভিন্ন জড় বস্তু মध्ये জমা হওয়া এই শক্তি তখন আবার উদ্ভিদের গ্রহণ উপযোগী হয়। আর এভাবে খাদ্যচক্রের মাধ্যমে বাস্তুতন্ত্রে প্রাকৃতিক শক্তির প্রবাহ চলতে থাকে।

সব ধরনের খাদ্য শিকলেই প্রতিটি স্তরে কিছু শক্তির অপচয় হয়। উৎপাদক সবুজ উদ্ভিদ থেকে ভূগোষ্ঠী প্রাণী যতটা শক্তি গ্রহণ করে তার শরীরে ততটা শক্তি জমা হয় না। আবার দ্বিতীয় স্তরের খাদক ভূগোষ্ঠী প্রাণীর দেহ থেকে যে পরিমাণ পুষ্টিদ্রব্য গ্রহণ করে তার নিষ্কাশনের দেহে সে পরিমাণ পুষ্টি পৌঁছে না, কিছুটা জড় পরিবেশে মুক্ত হয়। এভাবে এক জীব থেকে আরেক জীবে খাদ্যশক্তি স্থানান্তরের সময় বেশ কিছু শক্তি বাস্তুতন্ত্রের সাধারণ নিয়মেই এই তন্ত্রের বাইরে চলে যায়। এই কারণে খাদ্য শিকলে খাদ্যস্তরের সংখ্যা যত কমানো যায় শক্তির অপচয় তত কম হয়।

ট্রফিক লেভেলের মধ্যে শক্তির সম্পর্ক : খাদ্য শিকলের প্রতিটি স্তরকে ট্রফিক লেভেল বলে। সে হিসেবে উৎপাদক, প্রথম স্তরের খাদক, দ্বিতীয় স্তরের খাদক ও চূড়ান্ত স্তরের খাদক প্রত্যেকেই এক একটি ট্রফিক লেভেল। বাস্তুতন্ত্রে উৎপাদক প্রথম বা সর্বনিম্ন ট্রফিক লেভেলের প্রতিনিধিত্ব করে। ভূগোষ্ঠী খাদক অর্থাৎ প্রথম স্তরের খাদক দ্বিতীয় ট্রফিক লেভেলের প্রতিনিধি। এভাবে নিম্ন স্তরের মাংসাশী প্রাণী তৃতীয় ট্রফিক লেভেল ও উচ্চ পর্যায়ের মাংসাশী প্রাণী সর্বোচ্চ ট্রফিক লেভেলের প্রতিনিধিত্ব করে। কোনো খাদ্য শিকলের উৎপাদক বা সর্বনিম্ন ট্রফিক লেভেলে সূর্য থেকে যে শক্তি সঞ্চিত হয় পরবর্তী প্রতিটি ট্রফিক লেভেলে তার কিছু অংশ তাপ হিসেবে বেরিয়ে যায়। এজন্য দেখা যায় যে উৎপাদক যে পরিমাণ শক্তি সূর্য থেকে সংগ্রহ করে তা দ্বিতীয় ট্রফিক লেভেলে এসে কমে যায়। তৃতীয় বা সর্বোচ্চ ট্রফিক লেভেলে এসে শক্তির পরিমাণ আরও কমে যায়।

শক্তি পিরামিডের ধারণা : ত্রিকোণাকার ভূমির উপর অবস্থিত যে ত্রিমাত্রিক বস্তু শীর্ষদেশ সর্ব্ব ভাকে পিরামিড (Pyramid) বলে। কোনো একটি বাস্তুতন্ত্রে ট্রফিক লেভেলের গঠন একটি পিরামিড আকারে দেখানো যায়। খাদ্য শিকলে যুক্ত প্রতিটি পুষ্টিস্তরের শক্তি সঞ্চয় ও স্থানান্তরের বিন্যাস ছককে শক্তি পিরামিড বলে। উৎপাদক স্তরে পরবর্তী ট্রফিক লেভেলগুলোর চেয়ে শক্তির পরিমাণ অনেক বেশি। উচ্চতর ট্রফিক লেভেলের জীব নিম্ন ট্রফিক লেভেলের জীবদের চেয়ে শ্বসন ও অন্যান্য কাজে ক্রমবর্ধমান হারে অধিক শক্তি তাপ হিসেবে হারায়। এজন্য উৎপাদক পিরামিডের ভূমিতে এবং চূড়ান্ত খাদক শীর্ষে অবস্থান করে।



চিত্র ১৩.৬ শক্তির পিরামিড

খাদ্যশিকল সীমিত রাখতে শক্তি পিরামিডের প্রভাব

শক্তির এই প্রবাহ সবসময়েই একমুখী। এ শক্তি প্রবাহকে কখনও বিপরীতমুখী করা যায় না। প্রতিটি ধাপে শতকরা ৮০-৯০ ভাগ শক্তি কমে যায়। শক্তির এ ক্রমবর্ধমান কয় খাদ্য শিকলের আকারকে ৪ বা ৫টি ধাপের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে। খাদ্য শিকল যত দীর্ঘ হবে উর্ধ্বতম ট্রফিক লেভেলে শক্তির পরিমাণ ততই কমতে থাকবে এবং এক পর্যায়ে এসে কোনো শক্তিই অবশিষ্ট থাকবে না।

জীববৈচিত্র্য (Biodiversity)

জড় ও জীব নিয়ে আমাদের পৃথিবীর পরিবেশ গঠিত। এখানে রয়েছে বহু রকমের জীব ও অজস্র রকমের জড় পদার্থের সমাহার। কত ধরনের জীব আছে আমাদের এই পৃথিবীতে? এর সঠিক হিসেব দেওয়া খুব কঠিন, তবে প্রজাতি (যাদের দৈহিক ও জনন সংক্রান্ত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য পারস্পরিক সাদৃশ্যযুক্ত এবং যারা একই পূর্বপুরুষ হতে উদ্ভূত)-এর হিসেবে একে উপস্থাপন করা অনেকটা সহজতর। এখন পর্যন্ত প্রায় ১৫ লক্ষ প্রজাতির বর্ণনা ও নামকরণ পাওয়া যায়। প্রতিটি প্রজাতি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত এবং স্বকীয় বৈশিষ্ট্য দিয়ে যেকোনো একটি প্রজাতি অন্যসব প্রজাতি থেকে ভিন্ন ও শনাক্তকরণযোগ্য। যেমন কাঁঠাল একটি প্রজাতি এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য দিয়ে একে অন্যান্য প্রজাতি থেকে পৃথক করা সম্ভব। জীবদের মধ্যে বৈচিত্র্য থাকার কারণেই জীব জগৎকে লক্ষ লক্ষ প্রজাতিতে বিভক্ত করা সম্ভব হয়েছে। আবার মানুষ একটি প্রজাতি। বর্তমান পৃথিবীতে প্রায় সাতশ কোটি মানুষের বাস। এরা সবাই হুবহু একই রকম নয়, কোনো না কোনো বৈশিষ্ট্যে এরা পরস্পর পৃথক। অর্থাৎ একই প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত সদস্যদের মধ্যেও বৈচিত্র্য থাকে। তাই সংক্ষেপে বলতে গেলে বলা যায় পৃথিবীতে বিরাজমান জীব সমূহের প্রাচুর্য ও ভিন্নতাই হলো জীববৈচিত্র্য (Biodiversity)।

জীববৈচিত্র্যের প্রকারভেদ

জীববৈচিত্র্যকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়, যথা- (১) প্রজাতিগত বৈচিত্র্য (Species diversity), (২) বংশগতীয় বৈচিত্র্য (Genetical diversity) ও (৩) বাস্তুতান্ত্রিক বৈচিত্র্য (Ecosystem diversity)

প্রজাতিগত বৈচিত্র্য : প্রজাতিগত বৈচিত্র্য বলতে সাধারণত পৃথিবীতে বিরাজমান জীবসমূহের মোট প্রজাতির সংখ্যাকেই বুঝায়। কারণ, পৃথকযোগ্য বৈশিষ্ট্যেই এক প্রজাতি থেকে অন্য প্রজাতি ভিন্নতর। যেমন- বাঘের সাথে হরিনের আকার, স্বভাব, হিংস্রতা, সংখ্যা বৃদ্ধির ধরণ ভিন্ন হয়ে থাকে। এক প্রজাতির সাথে অন্য প্রজাতির বিভিন্ন বিষয়ে ভিন্নতাই প্রজাতিগত বৈচিত্র্য।

বংশগতীয় বৈচিত্র্য : একই প্রজাতিভুক্ত সদস্যগণের মধ্যেও অনেক বিষয়ে পার্থক্য দেখা যায়। যেমন একই প্রজাতি কিন্তু তাদের গড়ন, আকার, রোগ-প্রতিরোধ ও পরিবেশ প্রতিকূলতা সহ্য করার ক্ষমতা ভিন্ন। এই পার্থক্যগুলো তৈরি হয় তাদের জিন সংগঠনের সামান্য বৈচিত্র্যের কারণে। কারণ জিনের মাধ্যমেই জীবের বংশগতীয় বৈশিষ্ট্য বংশানুক্রমে সঞ্চারিত হয়। প্রত্যেক বৈশিষ্ট্যের জন্য নির্দিষ্ট জিন থাকে। বিভিন্ন কারণে এই জিনের গঠন ও বিন্যাসের পরিবর্তন হয়ে জীবের বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন হয় এবং নতুন প্রজাতির উদ্ভব হতে পারে। এই প্রক্রিয়ায় জীবের মধ্যে যে বৈচিত্র্য ঘটে, একেই বলা হয় বংশগতীয় বৈচিত্র্য।

বাস্তুতান্ত্রিক বৈচিত্র্য : একটি বাস্তুতন্ত্রের ভৌত উপাদান, রাসায়নিক উপাদান ও জৈবিক উপাদানগুলোর মধ্যে কোনো প্রকার পরিবর্তন দেখা দিলে সেখানকার বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্যে ব্যাঘাত ঘটে। এসব পরিবর্তন অবশ্যই ধীর ও ধারাবাহিক। এই পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য সেখানে বসবাসরত জীবের মধ্যেও পরিবর্তন সাধিত হয়। ফলে যে জীববৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয় তাকেই বলা হয় বাস্তুতান্ত্রিক বৈচিত্র্য। একটি ছোট পুকুরের বাস্তুতন্ত্রে যে সব উদ্ভিদ ও প্রাণীর বসতি গড়ে উঠে তা নদীর বাস্তুতন্ত্র থেকে ভিন্নতর। বন, তৃণভূমি, হ্রদ, নদী, জলাভূমি, পাহাড়, সাগর, মরুভূমি প্রভৃতি বাস্তুতন্ত্রে গড়ে উঠে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য সমৃদ্ধ এক একটি জীব সম্প্রদায়।

বাস্তুতন্ত্রের স্থিতিশীলতা রক্ষায় জীববৈচিত্র্যের প্রভাব : পরিবেশের উপাদানসমূহ পরস্পরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পর্কযুক্ত। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার স্বার্থেই এই জটিল সম্পর্কের সৃষ্টি হয়েছে। বিপুল সংখ্যক জীবের তৎপরতার মধ্য দিয়ে পরিবেশে এই ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। পরিবেশের কেবলমাত্র একটি বিশেষ প্রজাতির বিলুপ্তি বিরাট বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। সে কারণে পরিবেশ স্থিতিশীল রাখার জন্য জীববৈচিত্র্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

পরিবেশের যেসব জীব বা প্রাণীকে এক সময় অপ্রয়োজনীয় ও অবাস্তব মনে করা হতো সময়ের বিবর্তনে দেখা গেছে সেগুলোই পরিবেশ সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। এক সময় যুক্তরাষ্ট্রের চেকপিক উপকূলে ছিল অসংখ্য ঝিনুক। সেগুলো মাত্র তিনদিনে পরিশুদ্ধ করতে পারত গোটা এলাকার পানি। কিন্তু এখন সেই ঝিনুকের শতকরা ৯৯ ভাগ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। ফলে অবশিষ্ট ঝিনুকেরা এখন এক বছরেও ঐ পানি পরিশুদ্ধ করতে পারে না। এতে ঐ উপকূলের পানি ক্রমশই কদমাত্ত হচ্ছে এবং পানিতে অক্সিজেনের পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে। একটি পূর্ণবয়স্ক ব্যাঙ একদিনে তার ওজনের সমপরিমাণ পোকা-মাকড় খেতে পারে। এই পোকা-মাকড় আমাদের ফসলের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে। কিন্তু নানা ধরনের কীটনাশক ব্যবহারের ফলে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে ব্যাঙ। পাখিদের প্রধান খাদ্যই কীটপতঙ্গ। এর মধ্যে মানুষ ও ফসলের জন্য ক্ষতিকর কীটপতঙ্গই বেশি। তাছাড়া পরাগায়নের ক্ষেত্রেও পাখির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। পঁচা, ঈগল, চিল ও বাজপাখিকে আমরা শিকারি প্রজাতি বলে জানি। এরা ইঁদুর খেয়ে ইঁদুরের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণে রাখে। মানুষের বসতবাড়িতে বসবাসকারী একজোড়া ইঁদুর বিনা বাঁধায় বংশ বিস্তার করলে বছর শেষে ইঁদুরের সংখ্যা দাঁড়াবে

৮৮০ টিতে। কিন্তু একটি পেঁচা দিনে কমপক্ষে তিনটি ইঁদুর খেয়ে হজম করতে পারে। শকুন, চিল ও কাক প্রকৃতির জঞ্জাল সাফ না করলে রোগজীবাণুতে সয়লাব হয়ে যেত পৃথিবী। সে কারণে কোনো জীবকেই অপ্রয়োজনীয় বলা যায় না। পরিবেশ থেকে কোনো প্রজাতি বিলুপ্ত হলে বাস্তুতন্ত্রের স্থিতিশীলতা নষ্ট হয়ে যায়। কাজেই বাস্তুতন্ত্রের স্থিতিশীলতা রক্ষায় জীববৈচিত্র্যের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

বিভিন্ন জীবের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া, আন্তঃনির্ভরশীলতা ও পরিবেশের ভাৱসাম্যতা

সাধারণত সবুজ উদ্ভিদকে স্বনির্ভর বলা হয়, কারণ তারা স্বভোজী (Autotrophic), কিন্তু পরিবেশতাত্ত্বিক দিক থেকে চিন্তা করলে দেখা যায় যে, সবুজ গাছপালাসহ কোনো জীবই স্বনির্ভর নয়। গাছপালা, পশুপাখি, কীটপতঙ্গ ও অন্যান্য জীবজন্তু একে অপরের দ্বারা প্রভাবিত।

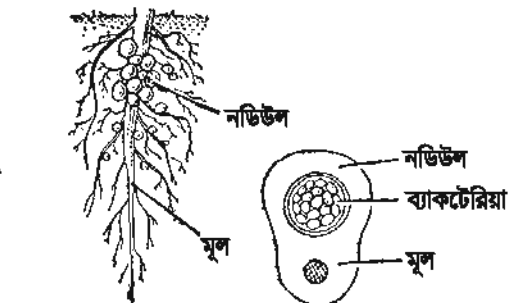
একটি সপুষ্পক উদ্ভিদ পর-পরাগায়নের জন্য (Cross pollination) কীট-পতঙ্গের উপর এবং বীজ বিতরণের জন্য পশুপাখির উপর নির্ভরশীল। প্রাণিকুল শ্বসনক্রিয়া দ্বারা যে কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO_2) গ্যাস ত্যাগ করে সবুজ উদ্ভিদকুল সালোকসংশ্লেষণের জন্য তা ব্যবহার করে। আবার সবুজ উদ্ভিদ দিবাভাগে যে অক্সিজেন (O_2) গ্যাস ত্যাগ করে শ্বসনের জন্য প্রাণীকুল তা ব্যবহার করে। তাছাড়া ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক ও বিভিন্ন প্রকার জীবাণু দ্বারা গাছপালা, পশুপাখি, কীটপতঙ্গ বিভিন্নভাবে প্রভাবিত হয়। এক কথায় বলা যায় যে, পারস্পরিক সংযোগ ও নির্ভরশীলতাই জীবনক্রিয়া পরিচালনার চাবিকাঠি। কাজেই জীবজগতে বিভিন্ন প্রকার গাছপালা ও প্রাণীদের মধ্যে বিদ্যমান জৈবিক সম্পর্কগুলোকে সহ-অবস্থান (Symbiosis) নামে আখ্যায়িত করা যায়। আর সম্পর্কযুক্ত জীবগুলিকে সহবাসকারী বা সহ-অবস্থানকারী (Symbionts) বলা হয়। এই সহ-অবস্থানকারী জীবগুলোর মধ্যে যে ক্রিয়া-বিক্রিয়া ঘটে তাকে মিথস্ক্রিয়া বলা হয়। উপরের আলোচনা থেকে এটিও পরিষ্কার হয়েছে যে মিথস্ক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী জীবগুলি পরস্পর আন্তঃনির্ভরশীল, কেহই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। তবে পরিবেশ বিজ্ঞানী ওডাম (Odum) বলেন যে এই আন্তঃনির্ভরশীল সম্পর্ক দুভাবে হতে পারে, যেমন—

(ক) ধনাত্মক আন্তঃক্রিয়া (Positive interactions) দ্বারা এবং

(খ) ঋণাত্মক আন্তঃক্রিয়া (Negative interactions) দ্বারা।

(ক) **ধনাত্মক আন্তঃক্রিয়া (Positive interactions) :** যে আন্তঃসম্পর্কে দুটি জীবের একটি অন্যটিকে সহায়তা করে তাকে ধনাত্মক আন্তঃক্রিয়া বলে। এ ক্ষেত্রে সহযোগীদের একটি বা উভয়ই উপকৃত হতে পারে। লাভজনক এ আন্তঃক্রিয়াকে মিউচুয়ালিজম (Mutualism) ও কমেনসেলিজম (Commensalism) নামে দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

মিউচুয়ালিজম (Mutualism) : সহযোগীদের উভয়ই একে অন্যের দ্বারা উপকৃত হয়। যেমন, মৌমাছি, প্রজাপতি, পোকামাকড় প্রভৃতি ফুলের মধু আহরণের জন্য ফুলে ফুলে উড়ে বেড়ায় এবং বিনিময়ে ফুলের পরাগায়ন ঘটে। অনেক পাখি এবং বাদুড় ফল খেয়ে বাঁচে এবং মল ত্যাগের সাথে ফুলের বীজও ত্যাগ করে। এ ভাবে বীজের স্থানান্তর হয় এবং উদ্ভিদের বিস্তার ঘটে। এ বীজ নতুন গাছ সৃষ্টিতে সাহায্য করে। একটি শৈবাল ও একটি ছত্রাক সহাবস্থান



ক. শিমজাতীর উদ্ভিদের মূলে নডিউল খ. লম্বাচ্ছেদে মূল ও নডিউলের

করে লাইকেন গঠন করে। ছত্রাক বায়ু থেকে স্ফীয়াবাল সঞ্চার এবং উভয়ের ব্যবহারের জন্য খনিজ লবণ সঞ্চার করে। অপরদিকে শৈবাল তার ক্লোরোফিলের মাধ্যমে নিজের জন্য ও ছত্রাকের জন্য শর্করা জাতীয় খাদ্য প্রস্তুত করে। রাইজোবিয়াম (*Rhizobium*) ব্যাকটেরিয়া শিম জাতীয় উদ্ভিদের (*Leguminous plant*) শিকড়ে অবস্থান করে গুটি (Nodule) তৈরি করে এবং বায়বীয় নাইট্রোজেনকে সেখানে সংরক্ষণ করে। এই নাইট্রোজেন সহযোগী শিম উদ্ভিদকে সরবরাহ করে এবং বিনিময়ে ব্যাকটেরিয়া সহযোগী উদ্ভিদ থেকে শর্করা জাতীয় খাদ্য পেয়ে থাকে।

কমেনসেলিজম (Commensalism) : এ ক্ষেত্রে সহযোগীদের মধ্যে একজন মাত্র উপকৃত হয়। অন্য সহযোগী সদস্য উপকৃত না হলেও কখনও ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। যেমন, রোহিনী উদ্ভিদ মূলের সাহায্যে নিজেকে মাটিকে আবদ্ধ করে এবং অন্য বড় উদ্ভিদকে আরোহণ করে উপরে উঠে। এরূপে অন্য বৃক্ষের উপর প্রসারিত হয়ে বেশি পরিমাণে আলো গ্রহণ করে। কাঠল গতা খাদ্যের জন্য অশ্রয় দানকারী উদ্ভিদের উপর নির্ভর করে না এবং তার কোনো ক্ষতিও করে না। পরাশ্রয়ী উদ্ভিদ বায়ু থেকে খাদ্য সঞ্চার করে, কিন্তু আশ্রয়দাতার কোনো ক্ষতি করে না। কিছু শৈবাল অন্য উদ্ভিদদেহের মধ্যে আশ্রয় নিয়ে বসবাস করে। কিন্তু আশ্রয়দাতার কোনো ক্ষতি করে না।



(ক) রোহিনী উদ্ভিদ



(খ) পরাশ্রয়ী উদ্ভিদ

চিত্র ১৩.৮ কমেনসেলিজম

(খ) ঋণাত্মক আন্তঃক্রিয়া : এ ক্ষেত্রে জীবদ্বয়ের একটি বা উভয়েই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ঋণাত্মক আন্তঃক্রিয়াকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন—

শোষণ (Exploitation) : এ ক্ষেত্রে একটি জীব অন্য জীবকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে নিজের অধিকার ভোগ করে। যেমন— স্বর্ণলতা। স্বর্ণলতা হস্টোরিয়া নামক চোবক অঙ্কের মাধ্যমে আশ্রয়দাতা উদ্ভিদ থেকে তার খাদ্য সঞ্চার করে। কোকিল কখনও পরিশ্রম করে বাসা তৈরি করে না। কাকের বাসায় সে ডিম পাড়ে এবং কাকের দ্বারাই তার ডিম কোটায়।

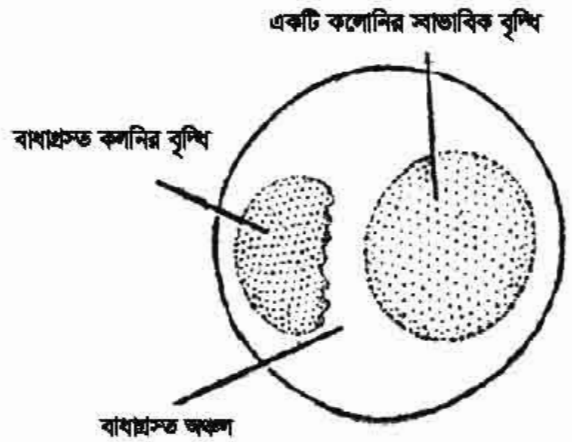


চিত্র ১৩.৯ : পোষণ

প্রতিযোগিতা (Competition) : কোনো নির্দিষ্ট স্থানে আলো, বাতাস, পানি ও খাদ্যের জন্য জীবসমূহের মধ্যে প্রতিযোগিতা হয়ে থাকে। এ প্রতিযোগিতার সবলরাই টিকে থাকে আর দুর্বলরা বিতাড়িত হয়ে থাকে।

অ্যান্টিবায়োসিস (Antibiosis) : একটি জীব কর্তৃক সৃষ্ট জৈব রাসায়নিক পদার্থের কারণে যদি অন্য জীবের বৃদ্ধি ও বিকাশ আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে বাধাপ্রাপ্ত হয় অথবা মৃত্যু ঘটে তখন সেই প্রক্রিয়াকে অ্যান্টিবায়োসিস বলে অণুজীবজগতের এ ধরনের সম্পর্ক অনেক বেশি দেখা যায়।

উপরের আলোচনা থেকে এটি প্রতীয়মান হয় যে পরিবেশে বিদ্যমান বিভিন্ন জীবের মধ্যে প্রতিনিয়ত ক্রিয়া বিক্রিয়া হচ্ছে এবং প্রত্যেকটি উপাদান পরস্পরের সাথে আন্তঃসম্পর্কযুক্ত। এই সম্পর্ক দ্বারা কেউ লাভবান হচ্ছে আবার কেউ ক্ষতিগ্রস্তও হচ্ছে। আর এভাবেই তারা পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রেখে চলেছে।



চিত্র ১৩.১০ : এন্টিবায়োসিস

পরিবেশ সংরক্ষণের পুরুত্ব ও গুরুত্ব

আমাদের পৃথিবী নামক গ্রহটিকে জীবের বসবাসযোগ্য করে রাখার জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ অপরিহার্য। এই পৃথিবীতে রয়েছে অসংখ্য জীব আর জীবন ধারণের বিভিন্ন উপাদান যেমন মাটি, পানি, বায়ু ইত্যাদি। বর্তমান পৃথিবীর অত্যধিক জনসংখ্যার বিভিন্ন ধরনের চাহিদা যেমন—অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ইত্যাদি মেটাতে যেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এই সমস্ত প্রাকৃতিক উপাদান। সংকটজনক এই পরিস্থিতিতে পরিবেশ সচেতন না হয়ে উঠলে বিপর্যয় আরও প্রকট আকার ধারণ করবে। আমাদের পরিবেশে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র উদ্ভিদ, কীটপতঙ্গ থেকে শুরু করে বৃহদাকৃতির প্রাণী বা উদ্ভিদ কেহই অব্যাহত বা মূল্যহীন নয়। প্রকৃতির রাজ্যে সকল জীব ও জড় পদার্থ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় একে অপরের সাথে বন্ধনে আবদ্ধ। লক্ষ লক্ষ প্রজাতির উদ্ভিদ, পশু পাখি, কীটপতঙ্গ, মানুষ ইত্যাদি নিয়ে গড়ে উঠেছে জীববৈচিত্র্য, যার উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে মানব জাতির কল্যাণ ও অস্তিত্ব। অরণ্য, পাহাড়, জলাভূমি, সমুদ্র জীববৈচিত্র্যের অতীব

প্রয়োজনীয় আধার। কাজেই পরিবেশ সুরক্ষিত থাকলে জীববৈচিত্র্য টিকে থাকবে। পরিবেশ সুরক্ষিত থাকলে মানুষের মৌলিক চাহিদাসমূহ যেমন অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, ঔষধ, জ্বালানি, পানিসহ প্রয়োজনীয় উপকরনাদি পরিবেশ থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে পাওয়া যাবে। পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হলে বিশেষ করে বনাঞ্চল ধ্বংস হলে বৃষ্টিপাতের হার কমে যায়, চাষাবাদের যথেষ্ট ক্ষতি হয়। গ্রীন হাউস গ্যাস (CO_2 , CO , CH_4 , N_2O ইত্যাদি) বৃদ্ধি পাবার ফলে তাপমাত্রা বেড়ে যায় যাকে গ্রীনহাউস এফেক্ট (Green house effect) বলে। গ্রীনহাউস এফেক্ট এর কারণে সমুদ্রের উচ্চতা বেড়ে যাবে ও উপকূল অঞ্চল তলিয়ে যাবে, আবহাওয়ার পরিবর্তন হবে, বনাঞ্চল ধ্বংস হবে, বিভিন্ন রোগবালাই এর প্রভাবে ফসলের ক্ষতি হবে, ঝড় জলোচ্ছাস এর তীব্রতা বেড়ে যাবে। পরিবেশ সুরক্ষিত থাকলে গ্রীনহাউস এফেক্ট থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। তাই এখন থেকেই পরিবেশ সত্বরক্ষণের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

মানুষ বর্তমানে তার নিজের অস্তিত্ব রক্ষার্থে পরিবেশকে সত্বরক্ষণের কথা জোরেশোরে বলা শুরু করেছে। সুস্থ পরিবেশ রক্ষার জন্য সমগ্র বিশ্বকে এগিয়ে আসতে হবে। পরিবেশ বিষয়ক আন্দোলন গড়ে তোলাও জরুরি। বৃক্ষরোপনকে শুধুমাত্র মাস বা সপ্তাহে সীমাবদ্ধ না রেখে প্রতিদিন যে গাছ কাটা হবে ঠিক তার দ্বিগুণ গাছ লাগানোর ব্যবস্থা করতে হবে। কোনো এলাকায় শিল্পকারখানা নির্মাণের পূর্বে সেই এলাকার পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব বিবেচনা করতে হবে এবং শিল্প বর্জ্যের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা করতে হবে। পরিকল্পিত নগরায়ন করতে হবে। নগরায়নের সাথে অবশ্যই বৃক্ষায়ন করতে হবে। জ্বালানি হিসেবে কাঠের পরিবর্তে সৌরশক্তির ব্যবহার করতে হবে। মাত্রাতিরিক্ত রাসায়নিক সার ও কীটনাশক মাটির গুণাগুণ নষ্ট করে, উপকারী জীবাণু, স্থলজ পোকামাকড় ধ্বংস করে, জলজ ও মাটির বাস্তুতন্ত্রকে নষ্ট করে। কাজেই জৈব সারের ব্যবহার বাড়াতে হবে। রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহার কমাতে হবে। মাত্রাতিরিক্ত জনসংখ্যা বিভিন্নভাবে পরিবেশের বিপর্যয় ঘটায়। জনসংখ্যা সীমিত রেখে সচেতন ও শিক্ষিত জনগোষ্ঠী গড়ে তুলতে হবে। পরিবেশ দূষণ রোধে পরিবেশের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে গনসচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়োজন। প্রচার মাধ্যমকে এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। কার্বন ডাইঅক্সাইড, মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড ইত্যাদি গ্রীন হাউস গ্যাসের উৎপাদন হ্রাস করতে হবে। উপকূলীয় অঞ্চলে ভূমিক্ষয় রোধ করতে প্রচুর পরিমাণে বনায়ন করতে হবে। এতে যেমন জলোচ্ছাস ও ঘূর্ণিঝড় রোধ হবে তেমনি ভূমিক্ষয়ও রোধ হবে। নদী খনন করে, এবং প্রাকৃতিক জলাধারগুলো সত্বরক্ষণ করে পানির স্বাভাবিক প্রবাহ অব্যাহত রাখতে হবে। এতে লবণাক্ততা ও জলাবদ্ধতা দূর হবে, পানির বাস্তুতন্ত্র স্বাভাবিক থাকবে। পরিবেশ সত্বরক্ষণের জন্য জীব বৈচিত্র্য সত্বরক্ষণ অত্যাবশ্যক এবং সেই লক্ষ্যে যে সমস্ত উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রকৃতি থেকে হারিয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে তাদেরকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় সত্বরক্ষণ করতে হবে। বায়ু দূষণ, পানি দূষণ, মাটি দূষণ, শব্দ দূষণ যাতে না হয় সে রকম সব ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিবেশ নীতিকে যথার্থভাবে অনুসরণ করতে হবে।

কাজ: তোমার এলাকার পরিবেশগত উপাদানসমূহ দূষিত হওয়ার কারণগুলো কী কী তা নির্ণয় কর এবং প্রতিবেদন তৈরি কর।

অনুশীলন

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

- ১। সিমবায়োসিস কী? ব্যাখ্যা কর।
- ২। প্লাজকটন বলতে কী বুঝায়?
- ৩। পরজীবী খাদ্য শৃঙ্খল কাকে বলে?
- ৪। অ্যান্টিবায়োসিস কাকে বলে?
- ৫। মিউচুয়ালিজম কাকে বলে?

রচনামূলক প্রশ্ন

- ১। বিভিন্ন জীবের মিথস্ক্রিয়া ও আন্তঃনির্ভরশীলতার মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় থাকে— ব্যাখ্যা কর।

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. কোনটি পরভোজী খাদ্য শৃঙ্খল?

ক. ঘাস হরিণ বাঘ

খ. মৃতজীব বিয়োজক অ্যামিবা

গ. জুরোপ্লাজকটন মাছ হাইড্রা

ঘ. সবুজ উদ্ভিদ পাখি শিয়াল

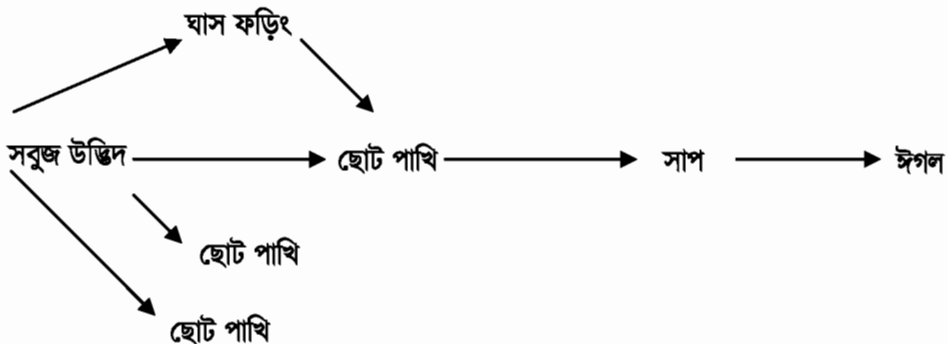
২. কমনসেলিজম এর মাধ্যমে প্রাণীরা—

- i. সহযোগীদের মধ্যে একজন উপকৃত হয়
- ii. সহযোগী সদস্য উপকৃত না হলেও ক্ষতিগ্রস্ত হয় না
- iii. সহযোগীদের উভয়ই উপকৃত হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i ও ii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii



উপরের চিত্রের আলোকে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও

৩. উপরোক্ত চিত্রে কয়টি খাদ্যশৃঙ্খল আছে?

ক. ১ টি

খ. ২ টি

গ. ৩ টি

ঘ. ৪ টি

৪. উদ্দীপকের আলোকে দ্বিতীয় স্তরের খাদক কোনটি?

ক. ছোট মাছ

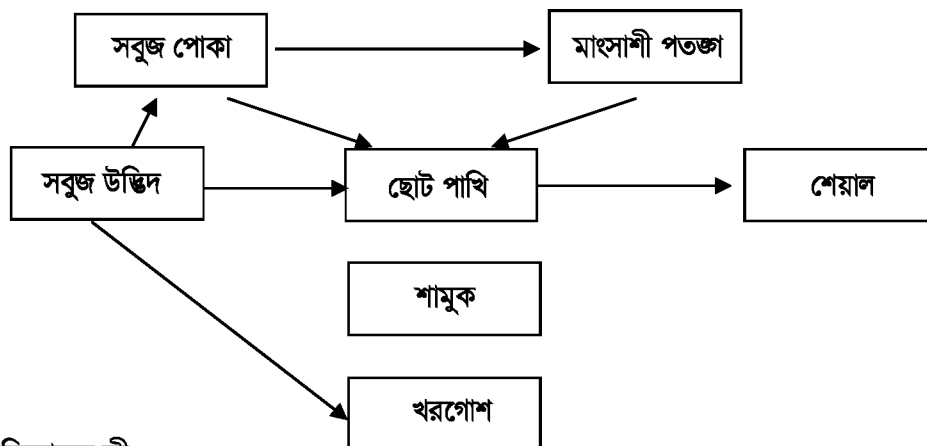
খ. শামুক

গ. খরগোশ

ঘ. ঘাস ফড়িং

સૃજનશીલ પ્રશ્ન

٤.



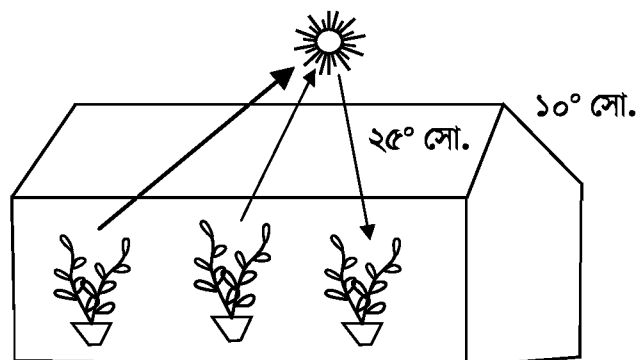
ক. বিয়োজক কী?

খ. খাদ্য জাল কী বুঝিয়ে লিখ?

গ. উপরের খাদ্য জালের কোন খাদ্য শৃঙ্খলটিতে সবচেয়ে বেশি শক্তি ব্যয় হয়, কারণ ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উপরোক্ত খাদ্য জালে ছোট পাখির বিলুপ্তি ঘটলে বাস্তুতন্ত্রের কী পরিণতি ঘটবে তা বিশ্লেষণ কর।

۲.



ক. জীববৈচিত্র্য কাকে বলে?

খ. কমনসেলিজম কী বুঝিয়ে লিখ।

গ. চিত্রে তাপমাত্রা ভিন্নতার কারণ ব্যাখ্যা কর।

ঘ. চিত্রে প্রক্রিয়াটির প্রতিক্রিয়া পরিবেশে কী প্রভাব বিস্তার করে বিশ্লেষণ কর।